বলাকায় নবরূপে রবীন্দ্রনাথ

প্রফেসর ড. ইয়াসমীন আরা লেখা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) কাব্যে একটা নতুন যুগ-একটা নতুন বাঁক-একটা নতুন ভাবধারার প্রতীক বলাকা (১৯১৫) কাব্য। যৌবন প্রাখর্য ও গতিবেগের শক্তি নিয়ে বলাকা কাব্য রবীন্দ্রকাব্য ধারায় নবজন্ম দিয়েছে। বলাকায় কবি আত্মবিকাশের বলিষ্ঠতা নিয়ে এলেন এবং কাব্য প্রকৃতিতে নতুনত্ব সঞ্চার করলেন। এই নতুনত্ব আধুনিক বিশ্ব মানবতাদের সঙ্গে রবীন্দ্র মানসের সংযোগ। এই সংযোগ রবীন্দ্রনাথের মানসপটেই পাশ্চাত্য জীবন পদ্ধতির কর্মময় প্রেরণার প্রভাব ধৃত আবহে উচ্চকিত। সৃষ্টির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি ক্রম অগ্রসরমান। গীতাঞ্জলিতে (১৯১০) কবি ছিলেন সমাজ থেকে একটু দূরে; আপন পরান সখার সঙ্গে একান্ডে় আসীন বা এক তরীতে কূল হাড়া। বলাকায় কবি সারা পৃথিবীর দুঃখ ও পাপেরভারে নিপীড়িত।

কোন প্রতিভার পুনর্জন্ম নিরলসভাবে অসম্ভব। সময় ও সমাজের গর্ভে বেদনাময় যুগ চৈতন্যমূলে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ সংলগ্ন হয়েই প্রতিভার নবজন্ম ঘটে। অবিরাম চলিষ্ণু দেশকাল উৎস থেকে শক্তি ও সত্য শোষণ করে রবীন্দ্র প্রতিভাও পুনর্জাত হয়েছে বারংবার। বলাকা সৃষ্টির প্রেক্ষাপটেও ঘনীভূত হয়ে আছে সময়, জীবন ও সমাজ অভিজ্ঞের গূঢ়ার্থবাহী সজীব ইতিহাস।

গীতালির সমসাময়িক কালে বলাকা রচিত হয়। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ পরিশোধিত হন একাধিক ঘটনায়।
এক) রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্য ভ্রমণ (২৪ মে ১৯১২-৬ অক্টোবর ১৯১৩)।
দুই) নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি (নভেম্বর ১৯১৩)।
তিন) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮)।
চার) ভারতের সমসাময়িক প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ঘটনাবলি।

রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুন ইংল্যান্ডে পৌঁছেন। তাঁর দেখা ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ইংল্যান্ডের বিশ শতকের ২য় দশকে গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে বিপুল। রেনেসাঁসের মানবতাবাদী প্রবর্তনা, ফরাসী বিদ্রোহজাত সাম্য, মৈত্রী, মানবতা এবং শিল্প বিপ-বের জনসুফল তখন নিঃশেষিত প্রায়। কৃষক জীবন বিপর্যস্ড়, স্ফীত শ্রমিক শ্রেণী শোষণ নিপীড়িত, মধ্যবৃত্ত শ্রেণী হতাশাগ্রস্ড়, পরিবর্তনমান জীবন-প্যাটার্নে চিন্ড়ায় ও চেতনায় ইংল্যান্ডের ভাবুক সমাজ সে সময় অস্থির, আত্মদীর্ণ, অন্ড়র্মনস্ক, প্রতিভাবান তর"ন সমাজ যখন আঠার শতকের কার্যকারণতত্ত্বে, উনিশ শতকের আদর্শবদে আস্থা হারিয়ে তীক্ষ্ণ অনুভুববৈদ্যতা, সহজাতবৃত্তি ও অন্ড়র্গত চেতনা প্রবাহকে নতুন মূল্যবোধ ও শিল্পাদর্শরূপে অনুধ্যানে অগ্রসরমান রবীন্দ্রনাথ তখন ইংল্যান্ডে তাঁদের মর্মমূল।

সৈয়দ আকরম হোসেন বলেন-
ইংল্যান্ডের মাটিতে পা দিয়েই তীক্ষ্নধী পর্যবেক্ষণ নিপুণ রবীন্দ্রনাথ উলি-খিত পরিবর্তন জীবন প্যার্টার্নের অন্যতম সূত্র যন্ত্র ও গতি সম্পর্কে সজাগ হন।
ইংল্যান্ডের ভাবুক সমাজের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেন। এই গতিবেগ কেবল জীবনের বহিরাঙ্গ দিক নয়, তাদের অন্ড়র্জগতেও এর তাৎপর্য নিগূঢ়। বছরাধিক কাল ইংল্যান্ডে বসবাসকালে তিনি ইউরোপীয় শিল্প সাহিত্যের প্রাণমূল থেকে সংগ্রহ করেন তাঁর পুনর্জাত হওয়ার জীব শক্তি।
সৈয়দ আকরম হোসেন বলেন-
নোবেল পুরস্কার তাঁকে করে তোলে অধিকতর বিশ্বসাহিত্য সচেতন এবং দায়িত্ববান। রবীন্দ্রনাথের ক্রমবর্ধমান আত্মবিশ্বাস, নিরলস সাধনা, মানসিক তীক্ষ্নতা, আমরণ তার"ন্য ও বিশ্ব সজাগতার প্রেক্ষাপটে নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তনা নিগুঢ় প্রাক যুদ্ধকালীণ ইউরোপীয় বেগমান জীবনমূল থেকে অর্জিত এবং চেতনায় লালিত নবতর জীবশক্তির শিল্পিত বিকাশে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি- নিঃসন্দেহে অনুকূল মানসিক আবহাওয়ার সৃজন করেছিল।
১৯১৪ সালের জুলাইয়ের শেষ দিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমরাগ্নি প্রজজ্বলিত হয়ে উঠেন। যুদ্ধের প্রকাশ্য ধ্বংসলীলা শুধু বেদনাদায়কই করল না, তাঁকে কর্মেও উদ্বুদ্ধ করল। আবু রশিদ আইয়ুব বলেন। "কবির সঙ্গে এসে একজন কর্মী এসে

যোগ দিল।" তৎকালীণ ভারতের প্রবীণ প্রধান রাজনীতিক ঘটনাবলী ও গূঢ়তর সমস্যাগুলি এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্ড়া-ভাবনার বিষয়বস্ড়ু হয়ে উঠেছিল। শুধু জাতীয় ক্ষেত্রে নয় তৎকালীণ বিশ্বের যাবতীয় জলন্ড় সমস্যাবলী তাঁকে বিশেষভাবে বিচলিত করেছিল। বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের তখনকার পরিস্থিতি নিয়ে ১৯১৫ সালের ৬ মার্চ ভারতের তথা বিশ্বের দুই চিন্ড়া নায়ক রবীন্দ্রনথ ও মহাত্মাগান্ধী আলোচনায় মিলিত হন। গান্ধীজী জনকল্যানের জন্য আদর্শ সত্যাগ্রহ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নেতৃত্বে অনেকগুলি সংগ্রাম পরিচালিত হয়। রবীন্দ্রনাথও সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

রবীন্দ্র জীবনে প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৫)। সবুজ পত্রের (১৩২১) ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কবি সবুজপত্রের প্রথম সংখ্যায় চির যৌবনের চির নবীনের জয়গান গেয়ে লিখলেন। সবুজের অভিযান (১৫ বৈশাখ ১৩২১)-

ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ
আধ মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।

'আহবান জীত' কবিতায় আমরা সবুজের অভিযানের সুরই শুনতে পাই। শঙ্খ, কবিতায় কবি যেন যোদ্ধার বেশে অবতীর্ণ হতে চাইলেন। জগতের যতকিছু অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের বির"দ্ধে তাঁর এই যুদ্ধ ঘোষণা। কবির আরদ্ধ জীবন দেবতার কছে শক্তি ভিক্ষা করে সংগ্রামের সংকল্পে গ্রহণ করলেন।-

তোমার কাছ আরাম চেষ্ট
পেলেম শুধু লজজা
এবার সকল অঙ্গ দেয়ে
পরাও রণ সজ্জা
ব্যাঘাত আসুক নবনব
আঘাত খেয়ে অটল রব
বক্ষে আমার দুঃখ তব
বাজবে জয় ডংক।

জড়বস্তু বাধা তা যে পঙ্কিল, অশুচি, অবর"দ্ধতার কূলুষে দূষিত এই ভাবটি কবি বিশ্বগতিতত্বের সাথে অবিছিন্নভাবে জড়িত। বিশ্বগত গতির আনন্দময়তার দিকটি 'চঞ্চলা' কবিতায় একটি পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেছে।
বলাই হচ্ছে একমাত্র সত্যরূপ। এ অনাসক্ত শোক ভয়াদি পার্থিব বিষয়ের অতীত সুতরাং স্থিতিশীল, রক্ষণশীল, বাসনাদির বিরোধী।

শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
উদ্যাম উধাও
ফিরে নাহি চাও
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে দোলে ফেলে যাও
কুরায়ে লওনা কিছু, করনা সঞ্চয়
নাই শোক নাই ভয়,
পথের আনন্দ বেগে অবাধে পাথেয় করো ক্ষয়।

এই শক্তির বিরাম বা স্মৃতিময় পূর্ণতা কল্পনার অতীত। জীবন সম্বন্ধিয় চিন্ড়া ধারার আশ্চর্যজনক আলোচনা ও বৃহৎ সমাজ জীবনের বিস্ড়ৃত আলোচনায় 'বলাকা' কাব্য ঝলমল করে উঠেছে। সব কিছু ছাপিয়ে এখানে মূল হয়ে দাঁড়িয়েছে জীবন ও যৌবন। মৃত্যু ও জরা অসত্য প্রমাণিত হয়ে এখানে জীবন মুখ্য, জীবন বাণীময়, এ তত্ত্বই নবতর আঙ্গিকে রূপলাভ করেছে।

জসীমউদ্‌দীন (১৯০২-১৯৭৬) এমন একজন কবি যিনি আধুনিক যুগে জীবনের ন্যায় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নাগরিকতার সর্বাত্মক প্রভাবের দিনে মূখ্যত পলীনিষ্ঠ কাব্য রচনা করে বাংলা সাহিত্যে পলীকবি হিসেবে অসামান্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র পলীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীবন ধারার আশ্চর্য সুন্দর আলেখ্য অঙ্কন করে অসাধারণ কবি খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন। তাঁর কাব্যে পলী মানুষের প্রাত্যহিক জীবনচর্চার বাস্‌তব চিত্র যেমন অঙ্কিত হয়েছে, তেমনি তাদের ক্ষুদ্র আশা-আকাঙক্ষা, দুঃখ- বেদনার কথাও সুর লাভ করেছে। পূর্ব বাংলার মূক পলী-প্রকৃতি ও তার ক্রোড়ের সন্‌তানমূল পলী নর-নারী যুগ যুগান্‌তরের সংকোচ কেটে যেন মুখর হয়ে উঠেছে তাঁর কাব্যে। জসীমউদ্‌দীন বাংলা সাহিত্যের একাধিক ধারায় পদচারণা করেছেন- কাব্য, নাটক, লোকগল্পের কথাকতা, স্মৃতিকথা, ভ্রমণ কাহিনী, উপন্যাস, জারিগান প্রভৃতি। তাঁর কাব্যগুলো আবার খ , কাহিনীকাব্য, শিশু কবিতা, কবিতা প্রভৃতি শ্রেণীর অন্‌তর্ভুক্ত।

গ্রামীণ জীবনের নিখুঁত চিত্র তাঁর কবিতায় কুশলতার সাথে অঙ্কিত। এ অঙ্কন রীতিতে আধুনিক শিল্প চেতনার ছাপ সুস্পষ্ট। নকশী কাঁথার মাঠ (১৯২৯), সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৪) ও মা যে জননী কান্দে (১৯৬৩) তাঁর বিখ্যাত গাথাকাব্য। রাখালী (১৯২৭), বালুচর (১৯৩০), ধানক্ষেত (১৯৩৩), রূপবতী (১৯৪৬), মাটির কান্না (১৯৫৮) ও সুচয়নী (১৯৬১) তাঁর জনপ্রিয় খ কবিতার সংকলন। গদ্যশিল্পী হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ। যাঁদের দেখেছি (স্মৃতিকথা, ১৯৫২), ঠাকুর বাড়ির আঙ্গিনায় (স্মৃতিকথা ১৩৬৮) ও জীবন কথা (আত্মজীবনী) (১৯৬৪) তাঁর সুখপাঠ্য গদ্যগ্রন্থ। হাসু (১৯৩৮), এক পয়সার বাঁশী (১৯৫৬), ডালিম কুমার (১৯৫১), রসালো শিশুতোষ গ্রন্থ। চলে মুসাফির (১৯৫২), হলদে পরীর দেশ (১৯৬৭), যে দেশে মানুষ বড় (১৯৬৮) প্রভৃতি তাঁর সুপরিচিত ভ্রমণ কাহিনী। পদ্মা'পাড় (১৯৫০), বেদের মেয়ে (১৯৫১), মধুমালা (১৯৫১), পলী বধু (১৯৫৬) ও গ্রামের মায়া তাঁর নাটক। বাঙ্গালির হাসির গল্প (১ম খ ১৯৬০ ও দ্বিতীয় খ -১৯৬৪) গল্প গ্রন্থ। বোবা কাহিনী (১৯৬৪) উপন্যাস। রঙ্গিলা নায়ের মাঝি (১৯৩৫), গাঙ্গের পাড় (১৯৬৪), জারিগান (১৯৬৮) ইত্যাদি তাঁর গানের সংকলন। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তাঁর কবিতা অনূদিত। নকশী কাঁথার মাঠ (১৯২৯) কাব্যটি 'ফিল্ড অব দি এমব্রডারি কুইল্ট' নামে ইংরেজিতে অনূদিত ও প্রকাশিত।

জসীমউদ্‌দীন কলোলীয় কোলাহল মুখর তিরিশের দশকে আবির্ভূত হয়েও অভিনবত্ব আনেন বাংলা কাব্যে, ভাবে, ঐতিহ্যে ও ভাষায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৬১-১৯৪১) তখনও নিত্য নতুন সৃষ্টির বৈচিত্র্যে রসিক পাঠকের মনোহরণ করে চলেছেন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজর“ল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) তখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে সমাসীন। তাঁর রক্ত মাতাল করা কবিতা ও গান তরুণদের প্রাণে তখন উন্মাদনার সঞ্চার করেছিল। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রভাবের বির“দ্ধে বিদ্রোহী বাণী উচ্চারণ করে এগিয়ে এলেন শক্তিমান আধুনিক কবিরা। এঁরা কাব্যে নতুনতর জীবন জিজ্ঞাসা যুগ-চেতনা ও বাস্‌তব দৃষ্টির পরিচয় দিয়ে নতুন বাকভঙ্গীর প্রবর্তনায় অভিনব রূপ-প্রতীকের ব্যবহার নৈপুণ্যে অসাধারণ মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। এ সময়ই জসীমউদ্‌দীন যুগ জীবনের সকল ঘাত প্রতিঘাত এড়িয়ে সকল জাটলতা পরিহার করে পলীর

অপেক্ষাকৃত নিস্ড়রঙ্গ, সাদামাটা জীবনের অপূর্ব মাধুর্যকে কাব্যে রূপারোপ করে বিষয়ের চমক সৃষ্টি করলেন। গেঁয়ো মাঠের সজল শীতল বাতাসের ন্যায়ই তাঁর কবিতা সেদিন অনেক ক্লান্ড়, অবসাদগ্রস্ড় নাগরিককে তৃপ্তি দিয়েছিল।

জসীমউদ্‌দীনের কবি কর্ম তার স্বভাব ধর্মেই জয়ী হয়েছে। আর এ স্বভাব ধর্মের বিকাশে পল-ী পরিবেশের সুনিবিড় আত্মীয়তা, বংশগত ঐতিহ্য, ইসলামের বিপ-বী সাম্যবাদজনিত মুসলিম সমাজ চেতনা,বাংলার শিক্ষা-দীক্ষা, পরবর্তীকালে পল-ীগীতি সংগ্রাহক হিসেবে লব্ধ-সমৃদ্ধ জীবনাভিজ্ঞতা, সমকালীন বুদ্ধিজীবী সমাজের পল-ী চেতনা অনেকটা সহায়ক হয়েছিল। ফলে জসীমউদ্‌দীনের জীবনে ও কর্মে পল-ী এক নিয়ামক শক্তিরূপে দেখা দিয়েছিল। তাই তিনি সমকালীন কবিত্বের বাঁধা পথ ছেড়ে কাব্যের মেঠো পথকেই সার বলে গ্রহণ করেছিলেন। স্বভাব ধর্মের সাড়া ছিল বলেই পল-ী কাব্যের ক্ষেত্রে তিনি হয়েছেন অসাধারণ সার্থকতার অধিকারী। আর তাই তাঁকে দিয়েছেন পল-ী কবির মর্যাদা।

জসীমউদ্‌দীন মূলত বেদনারই কবি। বাস্ড়ব অভিজ্ঞতায় তিনি দেখেছেন জীবনের আনন্দের চেয়ে দুঃখই অধিকতর সত্য - দুঃখের অগ্নিদাহেই নিয়ত চলছে সংসার পথিক নর-নারীর পরীক্ষা। এ দুঃখ চিরন্ড়ন। এ দুঃখেরই রূপকার জসীমউদ্‌দীন। এ দুঃখের হৃদয় স্ড়ম্ভনকারী চিত্র পাই, প্রথম খ- কবিতা রাখালীতে (১৯২৯) ও অপর খ- কবিতা বালুচরে (১৯২৭)। রাখালী ও বালুচরে কৃষক, জেলে, মাঝি, বৈরাগী প্রভৃতি জীবনের পটভূমিতে প্রেমের অনুষঙ্গ লিরিক্যাল পরিচর্যায় বিকশিত হয়েছে।

পল-ী জীবনের সঙ্গে সুনিবিড় একান্ড়তার প্রেক্ষাপটে কবিতায় তাঁর যে উচ্চারণ তা একান্ড়ভাবে হৃদয়স্পর্শী। তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রাখালী' (১৯২৭) এর দৃষ্টান্ড়। 'রাখালী' কাব্যে পল-ীবাসীদের বিচিত্র দুঃখ বেদনাকে এখানে মূল্য দিয়েছেন। প্রেম-ভালবাসা-বিরহ মিলন পূর্ণ বিচিত্র মানব জীবনই একাব্যে ভাষারূপ পেয়েছে। আমরা জানি গ্রামের বিপুল জনসাধারণ কৃষি-নির্ভর। এ কৃষি-নির্ভর বিপুল জনসাধারণকে বিচিত্র করবার যে আকাঙক্ষা তিনি লালন করেন, তার প্রমাণ রয়েছে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রাখালী'র নামকরণের মধ্যেই। এ কাব্যের 'রাখাল ছেলে' কবিতায় তিনি একজন রাখালের প্রাত্যহিকতা উন্মোচন করেছেন এভাবে-

"খেলা মোদের গান গাওয়া ভাই, খেলা লাঙল চষা,
সারাটা দিন খেলতে জানি জানিই নেকো বসা।"

অভাবগ্রস্ড় গ্রামীণ মানুষের চালচিত্র অঙ্কন করে জসীমউদ্‌দীন এ কাব্যে বিস্ময়কর পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাঁর এ পারদর্শিতা পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'বালুচরে'-ও (১৯৩০) প্রত্যক্ষ যোগ্য। এ কাব্যে পল-ী আবহ চিত্রণের পাশাপাশি মানুষের প্রতি তার মমত্ববোধ প্রকাশিত হয়েছে। এই কাব্যে তিনি সহজ-সরল-সংগ্রামশীল গ্রামীণ মানুষকে তাঁর স্মৃতিপটে ধরে রাখতে আগ্রহী। কিন্ড়ু এ চলমান বিশ্বে কাউকেই একান্ড়ভাবে হৃদয়ের সঙেগ করে রাখা যায় না। বিচিত্র কর্মের আহবানে মানুষ সমস্ড় হৃদয়িক সংবেদনাকে এক সময় তুচ্ছ মনে করে। কবি তাই আক্ষেপ করেনঃ-

এমন কে আছে কোথায়
নদী সোঁত সনে মিতালী পাতায়।
মানুষের মন তারো আগে ধায়; পিছু ডাক নাহি শুনে।
(করে অভিমান)।

'নদী সোঁতের মতো' মনের মানুষও অধরা। কবি গ্রামীণ জীবনের অতি পরিচিত প্রসঙ্গের অবতারণা করে চিরাচরিত মানব স্পর্শের তুলনা করেছেন বালুচরে ঘর বাঁধার সঙ্গে।

'ধানক্ষেত' (১৯৩১) কাব্যে ফসলের সঙ্গে কবি গ্রামীণ মানুষের সম্পর্ক আবিষ্কার করেছেন অত্যন্ড় চমৎকারভাবে ঃ-

'হেথায় নাহিকো সমাজ শাসন, নাহি প্রজার আর সাজা
মোর ক্ষেত ভরি ফসলেরা নাচে,আমি তাহাদের 'রাজা'।'

কাব্যের আধুনিকতা শুধু যে বক্তব্যের অভিনবত্বেই নয়, টেকনিকের পরিবর্তনও দাবী করে, এই সত্য তিনি অনুধাবন করেছেন পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ মাটির কান্নায় (১৯৫৮)। এই কাব্যে তিনি সমাজ সচেতন। ইসলামিক ঐতিহ্য এবং ভারতীয় পুরাণের প্রসঙ্গ উলে-খ করে তিনি ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের প্রতি প্রকাশ করেছেন সহমর্মিতা।

"বেহুলার শোকে কাঁদিয়াছি মোরা গংকিনী নদী সোঁতে
কত কাহিনীর ভেলায় ভাসিয়া গেছি দেশ দেশ হতে।
এমাম হোসেন, সকিনার শোকে ভেসেছে হলুদ পাটা
রাধিকার পার নুপুর সুখর আমাদের পার ঘাটা"।
(বাস্ড়ুত্যাগী)

আধুনিক কাব্যকলায় বিষয়ের সঙ্গে প্রকরণ-প্রসাধন অঙ্গাঙ্গীসূত্রে জড়িত। ভাষারীতিকে বিশেষ প্রকরণ কৌশল অবলম্বন করায় তাঁর বক্তব্য সহজ-সরল গ্রামীণ মানুষদের আকৃষ্ট করেছে সর্বাধিক। পুরাতন গল-ীগীতি-গাথার শব্দ, কাব্য, উপমা ও ছন্দের সঙ্গে উদ্ভাসিত শব্দ ও অলঙ্কারের সংমিশ্রণে তিনি যে কাব্য ধারা সৃষ্টি করেছেন তা উচ্চাঙ্গের শিল্পবোধের পরিচয়বাহী। পল-ীর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা প্রকাশের জন্যে তাঁর ভাষা যথার্থভাবে সার্থক। জসীমউদ্‌দীনের কবিতার ভাষা গ্রামীণ আবহযুক্ত অথচ গ্রাম্যতামুক্ত। সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য করার জন্যে তিনি পল-ী অনুষঙ্গ দ্যোতক অত্যাবশ্যক শব্দগুলোকে ব্যঞ্জনাকারে মার্জিত ভাষাকে সুকৌশলে কাব্য শরীরের সন্নিবেশিত করেছেন। তাঁর কবিতায় তৎসম, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দসমূহ ব্যবহার নৈপুণ্য হয়ে উঠেছে সার্থক। যেমন-

ঐদূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবীরের রাগে
অমনি করিয়া লুটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে।
(কবর)

অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রামীণ শব্দ ব্যবহার করেছেন তিনি। যেমনঃ

শেয়াল চলে শ্বশুর বাড়ি খালুই মাথায় দিয়ে।

(সোজন বাদিয়ার ঘাট)

আরবি-ফারসি শব্দের সুপ্রয়োগ করেছেন কবিঃ

"হাত জোড় করি দোয়া মাঙ দাদু।" আয় খোদা দয়াময়।

আমার বু-জীর তরেতে যেন গো ভেস্ড় নসিব হয়।"

(কবর)

অথবা

"হাত জোর করে দোয়া মাঙ দাদু, "রহমান খোদা! আয়;

ভেস্ড় নসিব করিও আজিকে আমার বাপ ও মায়!"

(কবর)

প্রচুর ধনাত্বক শব্দ সহযোগে কখনও কখনও কবিতার চরণ বিন্যাস করেছেন কবিঃ

"রাত থমথম স্ড়ব্ধ নিঝুম ঘোর ঘোর আঁধিয়ার।"

(পল-ী জননী)

উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, সমাসোক্তি নির্মাণেও তিনি ঈর্ষণীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। যেমনঃ-

<u>উপমাঃ</u>

পউষ রবির হাসির মতো আর একজনের হাসি

(কৃষাণী দুই মেয়ে/ ধানক্ষেত)

<u>উৎপ্রেক্ষাঃ</u>

একটি মেয়ে লাজুক বড়ো, মুখর আর একজন

লজ্জাবতীর লতা যেন জড়িয়ে গোলাম বন। (ঐ)

<u>রূপকঃ</u>

'চলে বুনোপথে জোনাকী মেয়েরা কুয়াশা কাফন ধরি।'

(পল-ী জননী)

সমাসোক্তিঃ

সারা দুনিয়ার যত ভাষা কেঁদে ফিরে গেল দুঃখে

(কবর)

পল-ী ছিল তাঁর ধ্যান, পল-ী তাঁর ভাবনা, পল-ী তাঁর আশ্রয়। দীর্ঘ কাব্য যাত্রায় তাঁর শেষ গন্ড়ব্য পল-ী। পল-ীই তাঁর কাব্যের অধিষ্ঠান ভূমি। ১৩৩২ সালে কলে-াল পত্রিকায় প্রথম তাঁর 'কবর' কবিতা প্রকাশিত হয়। এ কবিতায় পল-ী জীবনের এমন একটি করুণ মধুর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে যা বাঙালি পাঠকের মন সহজেই অধিকার করে নিয়েছিল। দীনেশ চন্দ্র সেন 'কবর' কবিতাটি পড়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি কবিকে লিখে জানান "দূরাগত রাখালের বংশি ধবনির মতো তোমার কবিতা আমার অন্ড়রকে স্পর্শ করেছে। তোমার কবিতা পড়ে আমি কেঁদেছি।"

সত্যি 'কবর' কবিতায় বাংলার পল-ীকে নতুন করে আবিষ্কার করা যায়। এ যেন চেনা মুখ, আর একবার ভালো করে দেখা।

পল-ীকবি পল-ীর গীতি ছন্দকে, পল-ীর প্রকৃতির প্রতিটি বস্ড়ুকে সার্থকভাবে কাজে লাগিয়েছেন। এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে জসীমউদ্‌দীন পল-ী জীবনকে আধুনিক রুচিসম্মত শিল্পরূপ দান করে যে কাব্য ধারা গড়ে তুলেছেন, সে ধারায় তিনি একক, অনন্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এক্ষেত্রে লোকসাহিত্যের লোকগীতি ও গীতিকার আশ্রয় পরিস্ফুট হলেও তার সৃষ্ট মানুষ, সমাজ ও ছবি সহজাত শিল্পবোধের মহিমায় সমুজ্জ্বল।